কথায় কথায় এথিকস্, লেখক- সোমনাথ চক্রবর্তী

বলতে বুঝতে হবে অপরাধের *প্রতিকার* (retribution) করা। এঁদের অভিমত নীতিবিদ্যায় *প্রতিকারাত্মক* তত্ত্ব (Retributive theory) নামে প্রসিদ্ধ হয়েছে। অন্য একদলের মতে, অপরাধের প্রতিকার নয়, অপরাধের *প্রতিরোধ-ই* (deterrence) হল শাস্তিদানের আসল উদ্দেশ্য। এঁরা প্রতিরোধবাদী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন। এঁদের তত্ত্বকে বলে *প্রতিরোধাত্মক* তত্ত্ব (Theory of deterrence)। তৃতীয় একটি মতানুযায়ী অপরাধের প্রতিকার অথবা প্রতিরোধ নয়, অপরাধীর সংশোধন (reform) হল শাস্তিদানের লক্ষ্য। এ তত্ত্ব *সংশোধনাত্মক* তত্ত্ব (Theory of reform) নামে পরিচিত হয়েছে। আমরা এবার এই তিনটি শাস্তিতত্ত্বের দিকে আলাদা আলাদাভাবে দৃষ্টি দেব।

৩. প্রতিকারাত্মক শাস্তিতত্ত্ব

শাস্তিতত্ত্বের আলোচনায় যে তত্ত্বটিকে *প্রতিকারাত্মক* তত্ত্ব নামে অভিহিত করা হয় তার একটা দীর্ঘ এবং বিশিষ্ট ইতিহাস আছে। শাস্তিবিধানের যেসব প্রথা প্রাচীন যুগে বিদ্যমান ছিল তার মূলে এ-জাতীয় তত্ত্বদৃষ্টির প্রভাব ছিল বলে মনে হয়। প্রাচীন সমাজে একটা অপরাধের প্রতিবিধান বা প্রতিকার করা হত অপরাধীকে সেই অপরাধের তুল্যমূল্য উচিত শাস্তি দিয়ে। যেমন, ক যদি খ-এর চোখ উপড়ে নেয় তাহলে তার শাস্তি হিসাবে ক-এরও চোখ উপড়ে ফেলা হবে। ক যদি খ-কে খুন করে তাহলে তার শাস্তি হিসাবে ক-এর মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য হবে, তার চেয়ে কম কোনো শাস্তি নয়, ইত্যাদি। উচিত শাস্তি বলতে তৎকালে এইরকমই বোঝা হত। এ-জাতীয় শাস্তিবিধানের মূলে শাস্তি সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণা কাজ করত। সেটা এই যে, শাস্তি মূলত প্রতিকারাত্মক (retributive)। অর্থাৎ কোনো অপরাধীকে তার কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দিতে গেলে প্রথমেই দেখতে হবে, এ শাস্তি দিয়ে অপরাধের যথাযথ প্রতিকার হচ্ছে কিনা। অর্থাৎ অপরাধী তার শিকারকে (victim) যতখানি যন্ত্রণা দিয়েছে ততটা যন্ত্রণা অপরাধীর ভাগ্যে জুটছে কিনা। উদাহরণস্বরূপ, ধরা যাক, ক-এর হাতে খ খুন হয়েছে। প্রতিকারাত্মক তত্ত্ব বলবে, এক্ষেত্রে ক-এর একটি শাস্তিই প্রাপ্য এবং তা হল মৃত্যুদণ্ড। তার কারণ ঃ ক যেহেতু খ-কে জীবনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তাই ক-এরও জীবিত থাকার কোনো অধিকার নেই। প্রতিকারাত্মক তত্ত্ব অনুসারে ক-এর জীবন কেড়ে নেওয়াই হবে এক্ষেত্রে ক-এর অপরাধের যথাযথ প্রতিকার। অর্থাৎ ক-এর উচিত শাস্তি।

ভালো করে দেখলে নজরে পড়বে যে, প্রতিকারাত্মক শাস্তিতত্ত্বের মধ্যে তিনটি আলাদা আলাদা নীতি (principle) সম্মিলিত হয়েছে। এগুলি হল ঃ

১. দায়িত্ব সংক্রান্ত নীতি (The Principle of Responsibility),

২. সমতারক্ষার নীতি (The Principle of Proportionality)

৩. উচিত শোধবোধের নীতি (The Principle of Just Requital)।

দায়িত্ব-সংক্রান্ত নীতিটির (The Principle of Responsibility) কথাই ধরা যাক।

এ নীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। শাস্তি এবং অপরাধের মধ্যে যাতে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই নীতিটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যে লোকের শাস্তি প্রাপ্য হয়নি তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না এবং শাস্তি একজনের একমাত্র তখনই প্রাপ্য হবে যদি সে কোন স্বেচ্ছাকৃত অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হয়—এই হল দায়িত্ব-সংক্রান্ত নীতির মূলকথা। ব্রাডলি তাঁর *এথিকাল স্টাডিজ* (১৯২৭) বই-তে অনেকটা এই ধরনের কথা বলেছেন। ব্রাডলির কথায় ঃ

> শাস্তি একমাত্র সেক্ষেত্রে শাস্তি বলে গণ্য যেখানে এ শাস্তি সত্যি সত্যিই প্রাপ্য। আমাদের দণ্ডভোগ করতে হয় একমাত্র এই কারণে যে, দণ্ডটি আমাদের প্রাপ্য হয়েছে। যদি এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে শাস্তি দেওয়া হয় তবে তা হবে ঘোর অনৈতিকতা, প্রকাশ্য অবিচার,.....।

লক্ষণীয়, ব্রাডলির দৃষ্টিতে শাস্তি হল স্বরূপত-লক্ষ্য (end-in-itself)। অপরাধীকে শাস্তি দিলে সমাজের কল্যাণ হবে বা অপরাধীর চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটবে, এসব কথা বলা ব্রাডলির অভিপ্রেত নয়। শাস্তি তোমার প্রাপ্য হয়েছে, অতএব তোমাকে শাস্তি পেতে হবে—এই হল ব্রাডলির শাস্তিতত্ত্বের সারকথা। প্রতিকারাত্মক শাস্তিতত্ত্বের মূলকথাও তাই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ব্রাডলি এ যুগের একজন কঠোর প্রতিকারবাদী (retributionist) হিসাবে পরিচিত ছিলেন।

নীতিতত্ত্বের আঙিনায় যাঁরা উপযোগবাদী (utilitarian) বলে চিহ্নিত তাঁদের চিন্তাধারার সঙ্গে ব্রাডলির অভিমত মেলে না। উপযোগবাদীরা শাস্তিকে স্বরূপত-লক্ষ্য হিসাবে দেখতে প্রস্তুত নন। তাঁদের মতানুসারে শাস্তি হল কোনো সামাজিক লক্ষ্যপূরণের উপায় (means) মাত্র। উপযোগবাদের প্রাণপুরুষ মিল এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, শাস্তিমাত্রের দুটি লক্ষ্য আছে। একটি হল অপরাধীর কল্যাণসাধন, অপরটি হল অন্যদের নিরাপত্তাদান। বলা বাহুল্য, প্রতিকারবাদী ব্রাডলি কখনই এ বক্তব্যের সঙ্গে সহমত হবেন না। এ-বিষয়ে কান্টের অভিমত আরও তীক্ষ্ণ।

> অপরাধীর স্বার্থেই হোক কিংবা সভ্যসমাজের স্বার্থেই হোক, শাস্তি কখনও ভিন্নতর কল্যাণসাধনের উপায় হিসাবে প্রণীত হতে পারে না। সবরকম শাস্তির মূল কারণ বলতে একটাই। তা এই যে, শাস্তিটি যার প্রতি ধার্য হচ্ছে সে কোনো না কোনো অপরাধ ঘটিয়েছে।
>
> (কান্ট ঃ *ফিলসফি অব্ ল*)

এখানে উল্লেখ্য, ব্রাডলির মত কান্টও শাস্তিতত্ত্বের ইতিহাসে প্রতিকারবাদী (retributionist) বলে পরিচিত।

দেখা যাচ্ছে, প্রতিকারবাদীরা শাস্তির (punishment) সঙ্গে অপরাধের (guilt) একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলে দাবি করছেন। প্রশ্ন হল ঃ এ সম্বন্ধটি কীরকম?

কেউ কেউ এতদূর দাবি করছেন যে, সম্বন্ধটি যৌক্তিক (logical)। অ্যানথনি কুইনটন এঁদের একজন। ১৯৫৪ সালে *অ্যানালিসিস* (১৪) পত্রিকায় 'অন পানিশমেন্ট'

বলে ওঁর একটি লেখা প্রকাশিত হয়। এ লেখায় কুইনটন দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে শাস্তির সঙ্গে অপরাধের একটা অনুসৃতির সম্বন্ধ রয়েছে। কাউকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে বললে তার থেকে যেন অনিবার্যভাবে এই কথাটা অনুসৃত হয় যে, সে অপরাধ ঘটিয়েছে। কুইনটন আমাদের কল্পনা করতে বলেছেন এমন একটা পরিস্থিতির কথা যেখানে কাউকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে অথচ সঙ্গে সঙ্গে এ-ও ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তাকে কোনো বিশেষ কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে না। কুইনটনের মতে, এমন পরিস্থিতি বস্তুত অকল্পনীয়। কুইনটন দাবি করেছেন, এটাই প্রমাণ যে, শাস্তির সঙ্গে অপরাধের একটা প্রতিপাদক-প্রতিপাদ্য সম্বন্ধ রয়েছে। অমুক কাজটা করা উচিত বললে যেমন তার দ্বারা অনিবার্যভাবে একথা প্রতিপাদিত হয় যে কাজটা করতে পারা যায়, ঠিক তেমনি অমুককে শাস্তিযোগ্য বললে সেই ঘোষণার দ্বারা এটা প্রতিপাদিত হয়ে যায় যে, সে কোনো না কোনো অপরাধে অপরাধী।

কান্ট এবং ব্রাডলির মত প্রতিকারবাদীরা কিন্তু এতেও সন্তুষ্ট নন। তাঁরা মনে করেন, শাস্তির সঙ্গে অপরাধের সম্বন্ধ কেবল যুক্তির দৃষ্টিতে অবশ্যগ্রাহ্য নয়, নৈতিক দৃষ্টিতেও অবশ্যগ্রাহ্য। অর্থাৎ, তাঁদের মতে, শাস্তির সঙ্গে অপরাধের সম্বন্ধটি নৈতিক সম্বন্ধও (moral relation) বটে। ব্রাডলি তাঁর পূর্বোক্ত *এথিকাল স্টাডিজ* বই-তে এই প্রসঙ্গে অপরাধীর দায়িত্ববোধের কথা টেনে এনেছেন। ব্রাডলির মতে, অপরাধীর শাস্তি প্রাপ্য হয় এইজন্যে যে, সে তার দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয় না। একজন নীতিবোধসম্পন্ন মানুষ হিসাবে তার কাছ থেকে আমরা আশা করি যে, সে তার কৃতকর্মের ফলাফল সম্বন্ধে সচেতন থাকবে। অর্থাৎ সে *স্বেচ্ছায়* (voluntarily) এমন কোনো কাজ করবে না যার ফলে সে শাস্তির উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়। ব্রাডলির মতে, একজন অপরাধী এইরকম দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয়ে থাকে। তাই তাকে শাস্তি পেতে হয়। অন্যভাবে বলা যায় ঃ একজন সত্যিকারের অপরাধী *জেনেশুনে* তার নৈতিক দায়িত্ব (moral responsibility) অস্বীকার করে বসে থাকে। তাই তাকে এ দায়িত্বভঙ্গের দায়িত্ব নিতে হয়। তাকে শাস্তি পেতে হয়।

এরপর *সমতারক্ষার নীতি* (The Principle of Proportionality) সম্বন্ধে দুই-একটি কথা।

আমরা দেখেছি যে প্রতিকারাত্মক শাস্তিতত্ত্বের (retributive theory of punishment) অন্যতম নীতি হল সমতারক্ষার নীতি। এ নীতি অনুসারে, প্রদেয় শাস্তি এবং সংঘটিত অপরাধের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে। অর্থাৎ অপরাধটি যতটা দুষ্কর্মের পরিচয় দিয়েছে, যতটা যন্ত্রণার কারক হয়েছে, প্রদেয় শাস্তিটিকে ঠিক ততটাই ক্ষতিকারক হতে হবে। এইভাবে সমতারক্ষার বিষয়ে বিবেচনা করে বলেই প্রতিকারাত্মক শাস্তিতত্ত্ব 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' জাতীয় নিয়ম মেনে চলতে তৎপর হয়।

কিন্তু সমস্যা হল, প্রতিটি শাস্তিপ্রদানের ক্ষেত্রে এরকম সমতারক্ষার নীতি মেনে চলা

সম্ভব কি? উদাহরণস্বরূপ, এ নীতি মেনে অপহরণের (kidnapping) শাস্তি দেওয়া যাবে কীভাবে? সমতারক্ষার নীতি মান্য করে অপহরণকারীকে শাস্তি দিতে গেলে তাকে-ই অপহরণ করা বিধেয়। এতে অপহরণকারী ব্যক্তিটির উপযুক্ত দণ্ড হল, এমন বিশ্বাস করা যায় না। অনুরূপ সমস্যা দেখা দিতে পারে ধর্ষণঘটিত কোনো অপরাধের ক্ষেত্রেও।

এ সমস্যা আপাতদৃষ্টিতে যতটা হাল্কা বলে মনে হয় প্রকৃতপক্ষে সমস্যাটি ততটা গৌণ নয়। বস্তুত এ সমস্যা প্রতিকারবাদীকে (retributionist) একটা উভয়সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়। প্রতিকারবাদীর সামনে এরকম ক্ষেত্রে মাত্র দুটি পথ খোলা থাকে। একটি হল 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' নিয়ম অনুযায়ী সমতারক্ষার নীতিটির রূপায়ণ ঘটানো। অপরটি হল 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' নিয়মটির সাহায্য ছাড়াই সমতারক্ষার নীতিটির ব্যাখ্যা দেওয়া। প্রথম পথটি নিলে প্রতিকারবাদী বিপদে পড়বেন। কেননা, সেক্ষেত্রে কোনো কোনো অপরাধের শাস্তি দেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে (যেমন, ধর্ষণঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে)। অন্যদিকে, দ্বিতীয় পথটি নিলেও প্রতিকারবাদী বিপদে পড়বেন। কেননা সেক্ষেত্রে তাঁকে বলতে হবে যে, কোনো বিশেষ নিয়মের ভিত্তিতে তিনি শাস্তি এবং অপরাধের সমতা রক্ষা করছেন না। যখন যেমন মনে হচ্ছে তার ভিত্তিতে তিনি এ সমতার রূপায়ণ ঘটাচ্ছেন। বলা বাহুল্য, সেক্ষেত্রে এটা বলা ছাড়া উপায় থাকবে না যে, সমতারক্ষার নীতি অবলম্বন করে প্রতিকারবাদী যেসব সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছেন সেগুলি যাদৃচ্ছিক (arbitrary) সিদ্ধান্ত মাত্র, এসব সিদ্ধান্তের মধ্যে আবশ্যিকতার (necessity) লেশমাত্র নেই।

সংক্ষেপে ঃ প্রতিকারবাদী যদি 'চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত' নিয়মটির আদর্শে শাস্তি এবং অপরাধের সমতারক্ষায় উদ্যোগী হন তাহলে তাঁর পক্ষে কোনো কোনো ক্ষেত্রে শাস্তিবিধান করাই অসম্ভব হয়ে পড়বে। অন্যদিকে, প্রতিকারবাদী যদি এ নিয়মের সাহায্য না নিয়ে শাস্তি এবং অপরাধের মধ্যে সমতারক্ষায় উদ্যোগী হন তাহলে তাঁর শাস্তিবিধানে যাদৃচ্ছিকতার (arbitrariness) দোষ লাগবে।

এরপর *উচিত শোধবোধের নীতি* (The Principle of Just Requital) সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ কথা। এ নীতির উদ্দেশ্য হল প্রতিকারবাদী শাস্তিদানের (retributionist punishment) যৌক্তিকতা প্রমাণ করা। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই নীতিটি প্রস্তুত হয়েছে। এ নীতি অনুসারে, অপরাধী যতটুকু ক্ষতির কারক হয়েছে ততটুকু ক্ষতি অপরাধীকে ফিরিয়ে দিলে তবেই ন্যায়বিচার হয় এবং এই হল শাস্তিদানের যৌক্তিকতা (justification)। বলা বাহুল্য, প্রতিকারবাদী শাস্তিবিধানের গতিপ্রকৃতির সঙ্গে এ-জাতীয় বক্তব্য খুব ভালো মেলে। তাই প্রতিকারবাদী শাস্তিতত্ত্বের অন্যতম অঙ্গ হিসাবে *উচিত শোধবোধের নীতিটি* স্বীকৃতি পেয়ে গেছে।

প্রশ্ন হল ঃ ক্ষতির বদলে ক্ষতি ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা অকল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণ

ফিরিয়ে দেওয়া, এসব কী অর্থে ন্যায়বিচারের সূচক? ক খ-এর ক্ষতি করেছে। এই হল একটা অকল্যাণ। এবার, খ বা অন্য কেউ যদি সেই ধরনের ক্ষতি ক-কে ফিরিয়ে দেয় তাহলে সেটা হবে দ্বিতীয় একটা অকল্যাণ। অর্থাৎ এরকম ক্ষেত্রে একটি নয়, মোট দুটি অকল্যাণের সৃষ্টি হচ্ছে। অথচ প্রতিকারবাদী বলছেন, একমাত্র এভাবেই নাকি ন্যায়বিচারের উপপত্তি হতে পারে। তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে, প্রতিকারবাদীর মতে এক এক করে দুটি অশুভ ঘটনা ঘটলে বা দুটি অকল্যাণ সৃষ্টি হলে তবেই শুভত্ব কিংবা কল্যাণের দেখা পাওয়া যায়? যা কল্যাণকর তা কি তাহলে দুটি অকল্যাণকর অবস্থার যোগফল মাত্র?

বলা বাহুল্য, এরকম বিচারধারা অনেকের চোখেই অস্বস্তিকর ঠেকেছে। নীতিতাত্ত্বিক এইচ. এল. এ. হার্ট তো বলেই ফেলেছেন যে, এ-জাতীয় নীতিবিচার হল রহস্যময় এক নৈতিক রসায়নের (moral alchemy) দৃষ্টান্ত। অথচ প্রতিকারবাদী যে শোধবোধের নীতিটিকে অগ্রাহ্য করবেন তারও উপায় নেই। কারণ, এ নীতি না মানলে তাঁকে শাস্তিদানের জাগতিক ফলাফলের নিরিখে শাস্তিদানের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ তাঁকে তখন এই কথাটা কবুল করতে হবে যে, অপরাধীর আত্মোন্নতির স্বার্থে বা সমাজের হিতার্থে শাস্তি দেওয়া হয়ে থাকে এবং এইরকম হিতসাধনপরায়ণতাই শাস্তিদানের যৌক্তিকতা। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর শাস্তিতত্ত্বের সঙ্গে ফলাফলবাদী (consequentialist) বা হিতবাদী (utilitarian) শাস্তিতত্ত্বের কোনো পার্থক্য থাকবে না। অন্যভাবে বলা যায় ঃ প্রতিকারবাদী শাস্তিতত্ত্ব তার নিজস্বতা হারিয়ে ফেলবে।

তার মানে ঃ প্রতিকারবাদী শাস্তিতত্ত্বকে তার নিজস্বতা বজায় রাখতে গেলে অবশ্যই *শোধবোধের নীতিটি* (The Principle of Requital) মান্য করে চলতে হবে। আবার সঙ্গে সঙ্গে এ শাস্তিতত্ত্বকে এদিকেও খেয়াল রাখতে হবে যে শোধবোধের নীতিটি মান্য করার দরুন কোনো তাত্ত্বিক বিপত্তি যেন দেখা না দেয়। অর্থাৎ এমন কথা যেন বলতে না হয় যে, শাস্তিদানের ক্ষেত্রে একটি অন্যায়ের প্রতিফলস্বরূপ আর একটি অন্যায়ের উদ্ভব হয়ে থাকে।

প্রশ্ন হল ঃ এমন কোনো প্রতিকারবাদীর কথা বলা যায় কি, যিনি এ দুটি শর্ত একযোগে পালন করতে সমর্থ হয়েছেন?

বলা বাহুল্য, প্রতিকারবাদীকে যদি এ কাজে সফল হতে হয় তাহলে তাঁকে দেখাতে হবে যে, সত্যিকারের কুকর্মের (wicked acts) শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে নতুন করে কোনো কুকর্মের সৃষ্টি হয় না। অর্থাৎ তাঁকে কুকর্মের এমন এক ব্যাখ্যা দিতে হবে যাতে প্রমাণ হয়, কুকর্মের শাস্তিবিধানে অন্যায় কিছু নেই। একমাত্র এভাবেই একজন প্রতিকারবাদী হার্ট-কথিত নৈতিক রসায়নের (moral alchemy) অভিযোগ এড়াতে পারেন।

কান্ট এই লক্ষ্যে অনেকখানি সফল হয়েছিলেন বলা যায়। কান্টের কাছে কুকর্মের একটাই লক্ষণ। তা হল সর্বোচ্চ নৈতিক বিধিটিকে (the moral law) ইচ্ছাকৃতভাবে

লঙ্ঘন করা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, কান্ট এরকম যাবতীয় কুকর্ম-কে শাস্তিযোগ্য বলে মনে করতেন না। অন্যভাবে বলা যায় ঃ কান্ট যেন কুকর্ম (wicked acts) এবং শাস্তিযোগ্য কুকর্ম (punishable wicked acts), এ দুটির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম বিভেদরেখা কল্পনা করেছিলেন। কান্টের দৃষ্টিতে একমাত্র সেইসব কুকর্ম শাস্তিযোগ্য যেগুলি আইনত দণ্ডার্হ অপরাধ (criminal acts)। কান্টের মতে, এসব অপকর্মের শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে নতুন করে কোনো অন্যায়ের বা অকল্যাণের সূচনা হতে পারে না। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে অপরাধীকে তার অন্যায় কাজের উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়ে দিলে তাতে অপরাধীর যত ক্ষতিই হোক না কেন, সেই ক্ষতিসাধন কান্টের মতে অন্যায়ের সূচক বলে গণ্য নয়।

আইনত দণ্ডনীয় কুকর্ম বলতে কান্ট বোঝেন সেইসব কাজ যেগুলি সরকারী নিয়মবিধির (public law) পরিপন্থী। এসব কাজ অন্যায় কেন? কান্ট বলবেন, এসব কাজ অন্যায় কেননা এগুলি নাগরিকদের বিধিবদ্ধ অধিকারভোগের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। নাগরিকদের আকাঙ্ক্ষাপূরণের জন্যে রাষ্ট্র যেসব সাধারণ ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে এসব কাজ সেই ব্যবস্থাদির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অন্যভাবে বলা যায় ঃ এ-জাতীয় দুষ্কর্ম সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষাপূরণের পথে বাধা সৃষ্টি করে, তার স্বাতন্ত্র্যে (freedom) হস্তক্ষেপ করে। কান্টের মতে, রাষ্ট্র এরকম ক্ষেত্রে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকতে পারে না। যে দুষ্কৃতী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করেছে তার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকেও হস্তক্ষেপ করতে হয়। রাষ্ট্রের নিয়মবিধি অনুযায়ী তাকে শাস্তি দিতে হয়। কান্ট বলেছেন, এর ফলে সেই দুষ্কৃতীর যত ক্ষতিই হোক না কেন তাতে নতুন করে কোনো অন্যায়ের বা কোনো অমঙ্গলের সূচনা হয় না। কারণ, রাষ্ট্র যখন এভাবে এই দুষ্কৃতীর অপচেষ্টায় বাধা দেয় তখন প্রকৃতপক্ষে নাগরিকদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যরক্ষার পথে বাধাগুলিই অপসারিত হয়। তাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (freedom) বিধিবদ্ধ পথে সর্বোচ্চায়নের দিকে এগিয়ে যায়।

৪. প্রতিরোধাত্মক শাস্তিতত্ত্ব

শাস্তিতত্ত্বের ইতিহাসে যে মতবাদটি *প্রতিরোধাত্মক* তত্ত্ব (Theory of deterrence) নামে অভিহিত হয়েছে সেটি মূলত উপযোগবাদীদের (utilitarians) দান। প্রতিকারবাদীর (retributionist) সঙ্গে প্রতিরোধবাদীর একটা প্রধান পার্থক্য এইখানে যে, প্রতিকারবাদীর মত তিনি অতীতমুখী নন। অর্থাৎ, অতীতে যে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছিল সেই অপরাধের তুল্যমূল্য শাস্তি অপরাধীকে দেওয়া গেল কিনা, শুধু এ-জাতীয় বিচারে প্রতিরোধবাদীর আগ্রহ নেই। বরং প্রতিরোধবাদীর দৃষ্টি ভবিষৎমুখী এবং ফলমুখী। শাস্তিদানের ফলে ব্যক্তির কী কল্যাণ হল, সমাজের কী কল্যাণ হল এসব কথাই তাঁর বিবেচ্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উপযোগবাদে (utilitarianism) অনুসৃত ফলাফলবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে এরকম ফলমুখী শাস্তিচিন্তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।

উপযোগবাদের পথিকৃৎ-দের মধ্যে জেরেমি বেনথাম অন্যতম। এহেন বেনথাম তাঁর

প্রিনসিপিলস অব্ পেনাল ল রচনায় এবং অন্যত্র শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রচুর কথা বলেছেন। বেনথামের মতে, শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল সমাজের হিতসাধন।

বেনথাম এবং তাঁর সহমর্মী উপযোগবাদীরা মনে করেন যে, মানুষের প্রতিটি কাজের মূলে আছে সুখলিপ্সা এবং দুঃখনিবৃত্তি-ইচ্ছা। অপরাধকর্ম যেহেতু একটা কাজ তাই এ কাজের মূলেও সুখবোধ এবং দুঃখবোধ থাকবে—এই হল তাঁদের সিদ্ধান্ত। ফলত অপরাধ মাত্রেই তাঁদের চোখে সুখবর্ধনের—তথা দুঃখমুক্তির—অবচেতন প্রয়াস হিসেবে গণ্য হয়েছে। অর্থাৎ, প্রতিটি অপরাধী তাঁদের মতে তার অসামাজিক কাজের মধ্য দিয়ে আসলে নিজের সুখ বাড়াতে চায়, নিজের দুঃখমুক্তি ঘটাতে চায়। প্রতিরোধাত্মক শাস্তি (deterrent punishment) হবু অপরাধীর এরকম অভীপ্সাকে প্রতিহত করে বলে তাঁরা মনে করেন।

অন্যভাবে বলা যায় ঃ মানুষ মাত্রেই দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। স্বেচ্ছায় দুঃখী হওয়া মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ। সুতরাং মানুষ যখন দেখে যে, কুকর্ম করার জন্যে একজন অপরাধীকে যারপরনাই শাস্তি পেতে হয়েছে তখন তার নিজের মধ্যে অন্যায়ভাবে সুখভোগের প্রবণতা থাকলেও সে ঐ প্রবণতা থেকে বিরত থাকতে যত্নবান হয়। কেননা, সে ইতিমধ্যে বুঝে গিয়েছে যে, অন্যায়ভাবে সুখভোগের এই প্রবণতা তাকে শেষ পর্যন্ত শাস্তিভোগের দিকে নিয়ে যাবে, দুঃখভোগের দিকে নিয়ে যাবে। এভাবে আমাদের অন্যায্য অভীপ্সাগুলিকে প্রতিরোধ করা-র (deter) মধ্যেই শাস্তিদানের সার্থকতা। বলা বাহুল্য, এ-জাতীয় অন্যায্য অভীপ্সা থেকে অধিকাংশ মানুষকে নিবৃত্ত করা গেলে সামাজিক কল্যাণের সূচনা হয়, সমাজের হিতসাধন হয়।

প্রতিরোধবাদী আসলে শাস্তিবিধানের দুইরকম উদ্দেশ্যের কথা বলতে চান। একটি শাস্তির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য (final aim) এবং অপরটি শাস্তির সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য (immediate aim)। শাস্তিদানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সমাজের সামগ্রিক হিতসাধন। কিন্তু সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য বলতে মানুষের নীতিহীন অভীপ্সাগুলির নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ মানুষের বাধাবন্ধনহীন কার্যকলাপের নিয়ন্ত্রণ।

বেনথামের রচনায় এর সাক্ষ্য মেলে। বেনথাম স্পষ্ট বলেছেন যে, মানুষের কার্যকলাপকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখাই হল শাস্তিদানের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য। মানুষের কার্যকলাপ বলতে এক্ষেত্রে বুঝতে হবে অপরাধী ব্যক্তিটির কার্যকলাপ অথবা অপরাধী-ভিন্ন অন্য সকলের কার্যকলাপ। অর্থাৎ যে ব্যক্তির কার্যকলাপে অপরাধধর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে তার কাজকর্ম যেমন শাস্তিদানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তেমনি একজন সাধারণ মানুষ যার মধ্যে অপরাধধর্মিতা সুপ্ত অবস্থায় আছে সে-ও অপরের শাস্তি দেখে নিজের অন্যায্য অভীপ্সাগুলিকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনে।

বেনথাম মনে করেন, প্রকৃত অপরাধীর কার্যকলাপ শাস্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় দুইভাবে। কখনও কখনও শাস্তির প্রভাব পড়ে অপরাধীর ইচ্ছাশক্তি বা অভিপ্রায়ের

(will) ওপর। এর ফলে অপরাধী নিজেকে সংযত করে তুলতে যত্নবান হয়। অর্থাৎ তার আত্মশুদ্ধি হয়। আবার কখনও কখনও শাস্তির প্রভাব পড়ে অপরাধীর বাহুবলের (physical power) ওপর। এক্ষেত্রে অপরাধীকে অক্ষম বা অশক্ত করে দেওয়ার মধ্য দিয়েই শাস্তিদানের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। অন্যদিকে, যারা এখনও অপরাধ করেনি, কিন্তু ভবিষ্যতে করে ফেলতে পারে, তাদের ক্ষেত্রে শাস্তির প্রভাব পড়ে কেবলমাত্র তাদের ইচ্ছাশক্তি বা অভিপ্রায়ের (will) ওপর। অন্যের শাস্তি দেখে এরা নিজেদের অসৎ ইচ্ছাগুলিকে দমন করতে উদ্যোগ নেয়। শাস্তির ভূমিকা এসব ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক।

বেনথামের এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, একজন প্রতিরোধবাদী কীভাবে শাস্তিদানের যৌক্তিকতা (justification) নিরূপণ করবেন। যেকোনো শাস্তিদানের ক্ষেত্রে প্রতিরোধবাদী সর্বমোট তিনটি প্রশ্ন তুলবেন। যথা ঃ

১. এ শাস্তির ফলে অপরাধীকে তার অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত করা যাবে কিনা এবং এ শাস্তির ফলে সে নিজে উন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে কিনা,

২. এ শাস্তির ফলে সমাজের অন্য সকলে এইরকম অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত হবে কিনা, এবং

৩. এ শাস্তির ফলে সমাজ এ-জাতীয় অপরাধীর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে কিনা।

ওপরের তিনটি প্রশ্নের প্রতিটির ইতিবাচক (affirmative) উত্তর মিললে তবেই একজন প্রতিরোধবাদী প্রাসঙ্গিক শাস্তিটিকে ন্যায্য বলবেন। অন্যভাবে বলা যায় ঃ প্রতিরোধবাদীর দৃষ্টিতে একটা শাস্তির যৌক্তিকতা নির্ভর করে অন্তত তিনটি বিষয়ের ওপর। যথা ঃ স্বয়ং অপরাধীর ক্ষেত্রে এ শাস্তির ফলাফল কীরকম হতে পারে তার ওপর (consequences for the offender), সম্ভাব্য অপরাধীদের ক্ষেত্রে এ শাস্তির ফলাফল কীরকম হতে পারে তার ওপর (consequences for potential offenders) এবং সাধারণভাবে সমাজের ওপর এ শাস্তির ফলাফল কীরকম হতে পারে তার ওপর (consequences for the society at large)।

কিন্তু সমস্যা হল, এভাবে শাস্তিদানের যৌক্তিকতা নিরূপণ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত প্রায় কোনো শাস্তিকেই ন্যায্য বলা যাবে না। কেননা, এমন শাস্তির সাক্ষাৎ পাওয়া সত্যিই দুষ্কর যেখানে এই তিনটি শর্ত একযোগে পালিত হতে পারে।

প্রথম শর্তটির কথাই ধরা যাক। প্রতিরোধবাদী বলছেন যে, ন্যায্য শাস্তি অপরাধীকে ভবিষ্যৎ অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত করবে এবং তাকে সমাজে বসবাসের উপযোগী করে তুলবে। কিন্তু বাস্তবে কোনো শাস্তিই এই মর্মে গ্যারান্টি দিতে পারে না যে শাস্তিভোগী মানুষটি ভবিষ্যতে কোনোদিন কোনো অবস্থায় অপরাধকর্মে লিপ্ত হবে না। একমাত্র মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে বলা যায় যে দণ্ডিত ব্যক্তিটির পক্ষে ভবিষ্যতে কোনো অপরাধকর্মে লিপ্ত হওয়ার সম্ভবনা নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রতিরোধবাদী শর্তের বাকী অংশটা অকার্যকর থেকে যাচ্ছে। কারণ, এ ব্যক্তির পক্ষে সমাজে ফিরে এসে স্বাভাবিক জীবনযাপনে অংশ

নেওয়া সম্ভব নয়। এরকম মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়নি সেটা অন্তত পরিষ্কার।

প্রতিরোধবাদী অবশ্য সেইসব শাস্তির কথা বলতে পারেন যেখানে অপরাধীটি অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের কথা বলতে পারেন। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যদি সত্যি সত্যিই যাবজ্জীবন হয় এবং এ দণ্ডের ক্ষেত্রে যদি প্যারোলে মুক্তির সুযোগ না থাকে তাহলে আশা করা যায়, দণ্ডভোগী অপরাধী তার জীবদ্দশায় অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকে থাকবে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও ধরে নিতে হবে যে, দণ্ডিত ব্যক্তিটি দণ্ড চলাকালীন কারাগারের মধ্যে কোনো অপরাধকর্মে লিপ্ত হচ্ছে না। তা ছাড়া, এরকম যাবজ্জীবন কারাবাস তাকে সত্যিকারের সামাজিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হতে সাহায্য করবে কিনা সেটাও মস্ত বড় প্রশ্ন। তা ছাড়া, তর্কের খাতিরে ধরা যাক, দশ বছর একাদিক্রমে কারাবাসের পর একদিন নিশ্চিত হওয়া গেল যে, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত এই ব্যক্তি এখন সুস্থ সমাজে বসবাসের উপযোগী হয়েছে। প্রতিরোধবাদী সেক্ষেত্রে কী করবেন? এ অপরাধীর মুক্তি দাবি করবেন? যদি করেন, সেক্ষেত্রে এ দণ্ডিত ব্যক্তির অতি গর্হিত অপরাধের কথা তাঁর বিবেচনার মধ্যে থাকবে তো? অপরাধী শাস্তিভোগ করে মূলত তার স্বকৃত অপরাধের জন্যে, এই সহজ সত্যটা তিনি মনে রাখবেন তো?

প্রতিরোধবাদী এবার সেইসব শাস্তির কথা বলতে পারেন যেখানে অপরাধীটি অনির্দিষ্টকালের জন্যে নয়, নির্দিষ্ট কিছুকালের জন্যে কারাদণ্ড ভোগ করছে। প্রতিরোধবাদী দাবী করতে পারেন, এরকম কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিটি অন্তত কিছুকালের জন্যে অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকছে। তা ছাড়া, তিনি এমন আশাও করতে পারেন যে, কারাগারে বন্দী থাকতে থাকতেই এ ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি ঘটবে। এ ব্যক্তি সভ্যসমাজে বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত অপরাধবিজ্ঞানীদের অভিমতের সঙ্গে তাঁর অভিমত এক্ষেত্রে মেলে না। বেশিরভাগ অপরাধবিজ্ঞানী এ-বিষয়ে একমত যে, অপরাধীকে কারাগারে বন্দী রেখে সংশোধন করবার চেষ্টা বাতুলতা। জেলখানা মাত্রেই দাগী অপরাধীদের জায়গা। প্রথমবারের অপরাধী সেখানে বেশিদিন থাকলে তার চিত্তশুদ্ধি ঘটা দূরের কথা, তার অপরাধপ্রবণতাই অতিমাত্রায় বেড়ে যেতে পারে।

তা ছাড়া, প্রতিরোধবাদী যখন দাবি করেন যে, ন্যায্য শাস্তি অপরাধীকে ভবিষ্যৎ অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত করবে এবং তাকে সুস্থ সমাজে বসবাসের উপযোগী করে তুলবে, তখন তাঁর এই দাবির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম অসংগতির আভাস থেকে যায়। অসংগতিটা হল, অপরাধীকে তার ভবিষ্যৎ অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত করতে হলে যে সামাজিক মতাদর্শে আস্থা রাখতে হয় আর অপরাধীকে সুস্থ সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হলে যে সামাজিক মতাদর্শের আশ্রয় নিতে হয়, সেই দুটি মতাদর্শ পরস্পর-বিরোধী। একটি সামাজিক বিচ্ছিন্নতার (social separation) মতাদর্শ। অপরটি

সামাজিক বন্ধনের (social cohesion) মতাদর্শ। প্রতিরোধবাদী যখন দাবি করেন যে, ন্যায্য শাস্তির ফলে অপরাধী ভবিষ্যৎ অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকবে, তখন অলোকিক নিজের অজান্তেই তিনি সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতাদর্শটি মেনে নেন। কারণ তিনি ধরে নেন, অপরাধীকে স্বাভাবিক সমাজ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করার সূত্রেই এ অপরাধনিবৃত্তির সূচনা হবে। উদাহরণস্বরূপ, যে ব্যক্তিটি স্বল্পমেয়াদী কারাদণ্ড ভোগ করছে তার কথাই ধরা যাক। প্রতিরোধবাদী জানেন যে, কারাদণ্ড চলাকালীন এই মানুষটি তার আত্মীয়-পরিজন বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে, তার ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে, স্বাভাবিক সমাজ-জীবনে ফিরতে পারা নিয়ে তার প্রবল সংশয় থাকবে। এককথায় দণ্ডভোগের সময়টুকু এ ব্যক্তি নিরন্তর সামাজিক বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকবে। প্রতিরোধবাদীর মতে, কৃতকর্মের ফলে অর্জিত এই সমাজবিচ্ছিন্নতা অপরাধীকে ভবিষ্যতে এরকম অন্যায় থেকে নিবৃত্ত হতে শেখাবে। এর থেকে বোঝা যায়, প্রতিরোধবাদী যখন অপরাধীর অপরাধনিবৃত্তি নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন তখন একটা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার (social separation) মতাদর্শ তাঁর শাস্তিকল্পনাকে প্রভাবিত করে। কিন্তু এই প্রতিরোধবাদীই যখন দাবি করেন যে, ন্যায্য শাস্তির ফলস্বরূপ অপরাধী ব্যক্তিটি সুস্থ সমাজে বসবাসের উপযুক্ত হয়ে উঠবে তখন তাঁর শাস্তিকল্পনা সামাজিক বন্ধনের (social cohesion) মতাদর্শে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। কারণ, তখন তাঁর কল্পনায় ভাসে এমন শাস্তির কথা, যে-শাস্তি শেষ পর্যন্ত হতমান মানুষটিকে ফিরিয়ে দেবে তার স্বজনের কাছে, তার সমাজের কাছে।

প্রতিরোধবাদী অবশ্য বলতে পারেন যে, এর মধ্যে অসংগতির কিছু নেই। সামাজিক সুসঙ্গতি বজায় রাখাটাই তাঁর শাস্তিকল্পনার মূলকথা। অপরাধীকে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা শাস্তিদানের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নয়। যেটুকু বিচ্ছিন্নতা অপরাধীর প্রাপ্য হয় তা তার সুস্থ সুসঙ্গত সমাজজীবন যাপনের স্বার্থেই।

আপাতদৃষ্টিতে এ উত্তর বেশ গ্রহণযোগ্য মনে হলেও এর মধ্যে একটা বিপদের দিক আছে। বিপদটা হল দণ্ডনীতি (penal code) রচনা করা নিয়ে। প্রতিরোধবাদীকে একটা দণ্ডনীতি তো রচনা করতে হবে। প্রশ্ন হল ঃ সেই দণ্ডনীতির ভিত্তিটি কী হবে? অপরাধীকে সাময়িকভাবে সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার কল্পনা এ দণ্ডনীতির মূলভিত্তি হবে? না কি, অপরাধীকে সুস্থ সমাজজীবনের অঙ্গ করে তোলার কল্পনা এ দণ্ডনীতির মূলভিত্তি হবে? প্রতিরোধবাদী একটু আগে যেভাবে তাঁর শাস্তিকল্পনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে মনে হয়, দ্বিতীয়টিই তাঁর দণ্ডনীতির মূলভিত্তি হওয়া উচিত, প্রথমটি নয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁর দণ্ডনীতি প্রতিরোধবাদী দণ্ডনীতি (deterrent penal code) বলে গণ্য হতে পারে কি? যে দণ্ডনীতি অপরাধীকে কিছুদিন অন্তত সমাজজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার লক্ষ্যে প্রণীত হয়নি সেই দণ্ডনীতির মধ্যে অপরাধীকে নিবৃত্ত করে রাখার আদর্শ ফুটে উঠবে কীভাবে? আর, তাই যদি না হয় তাহলে এ দণ্ডনীতি প্রতিরোধবাদী (deterrent) দণ্ডনীতি বলেই বা গণ্য হবে কীভাবে?

ন্যায্য শাস্তির লক্ষণ হিসাবে প্রতিরোধবাদী দ্বিতীয় একটি শর্তপূরণের কথাও বলেছিলেন। *দ্বিতীয় শর্তটি* ছিল এইরকম যে, ন্যায্য শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হবে। অর্থাৎ এ শাস্তি শুধু প্রকৃত অপরাধীকে নয়, সম্ভাব্য সব অপরাধীকেও (potential offenders) অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শাস্তিদানের এই দিকটি উপযোগবাদীদের (utilitarians) দৃষ্টিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ। উপযোগবাদী বেনথাম মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণকল্পে যেসব বহিঃস্থ নিষেধাজ্ঞা (external sanctions) প্রস্তুত করেছিলেন সেইসব নিষেধাজ্ঞার মধ্যে শাস্তিদানের এই লক্ষ্যটি প্রধান একটা জায়গা অধিকার করে আছে।

সমস্যা হল ঃ প্রতিরোধবাদী শাস্তিবিধানের প্রথম শর্তটির মত দ্বিতীয় শর্তটিও নানারকম বিভ্রান্তির কারক।

প্রথমত, এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, একজনকে শাস্তি পেতে দেখলে অন্যেরা সঙ্গে সঙ্গে সেই অপরাধ করা থেকে নিবৃত্ত হবে। প্রাচীন ইংল্যাণ্ডে চুরির সাজা ছিল প্রকাশ্যে ফাঁসি। কিন্তু ইতিহাস বলছে, অনেক ক্ষেত্রে এরকম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সময় সমবেত জনতার মধ্যে পকেটমাররা নিজেদের কাজ হাসিল করে নিত। চোখের সামনে একজন অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝুলতে দেখেও অন্যজন যখন একই অপরাধ ঘটিয়ে যেতে পারে তখন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কল্পনাটাই নিরর্থক বলে মনে হয়। তা ছাড়া ইদানীংকালের সভ্যসমাজে মৃত্যুদণ্ডের মত গুরুদণ্ডগুলি কার্যকর হয় লোকচক্ষুর অন্তরালে। আমরা খবরের কাগজ পড়ে বা রেডিও শুনে (টেলিভিশনে এসব দণ্ড কার্যকর হওয়া *দেখায় না*) এ সম্বন্ধে জানতে পারি। চাক্ষুষ দেখা-ই যদি অপরাধীকে নিবৃত্ত করতে না পারে তাহলে এরকম পরোক্ষ জ্ঞান যে সম্ভাব্য অপরাধীকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করবে না, তা বলাই বাহুল্য।

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মাত্রেই অপরাধীকে একটা উদ্দেশ্যসাধনের উপায় (means) হিসাবে ব্যবহার করে। এসব ক্ষেত্রে অপরাধীকে সাজা দেওয়া হয় প্রধানত এই আশায় যে, অপরাধীকে গুরুদণ্ড পেতে দেখলে অন্যেরা এ অপরাধের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে সাহস করবে না। অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তিটি এখানে যেন অপরাধনিবৃত্তির একরকম হাতিয়ার হিসাবে গণ্য হয়। কিন্তু অনেকের মতে, এ-জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি অন্যায্য। উদাহরণস্বরূপ, কান্ট কখনও এরকম শাস্তিবিধান মেনে নিতে পারবেন না। কান্টের মতানুসারে প্রতিটি ব্যক্তিজীবন স্বতঃমূলব্যান। যুক্তিবোধসম্পন্ন জীব মাত্রেই তাঁর দৃষ্টিতে স্বরূপত লক্ষ্য (end-in itself)। তাই কান্ট কোনোমতেই অপরাধনিবৃত্তির উপায় হিসাবে অপরাধী ব্যক্তিকে ব্যবহার করার প্রস্তাবে সায় দিতে পারবেন না। বস্তুত কোনো প্রতিকারবাদীর (retributionist) পক্ষেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিবিধানের বৈধতা মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তার কারণ ঃ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিবিধানের ক্ষেত্রে অপরাধের প্রতিকার

করা বড় কথা নয়। অপরাধের গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শাস্তির ব্যবস্থা করা এ-জাতীয় শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্য নয়। পক্ষান্তরে, একজন অপরাধীর করুণ পরিণতি দেখিয়ে সমাজের অন্য দশজনকে এরকম দুষ্কর্ম থেকে নিবৃত্ত করাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, প্রতিকারবাদীর (retributionist) পক্ষে এ শাস্তিবিধানের যৌক্তিকতা মেনে নেওয়া অসম্ভব।

তৃতীয়ত, দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মাত্রেই ন্যায্য বলে গণ্য হলে নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়াও ক্ষেত্রবিশেষে ন্যায্য বলে গণ্য হয়ে যাবে। বস্তুত পৃথিবীর ইতিহাসে এমন অনেক স্বৈরাচারী শাসকের কথা পাওয়া যায় যাঁরা জনমানসে ভীতি সঞ্চারের জন্যে কখনও কখনও নিরীহ ব্যক্তিদেরও বধ্যভূমিতে পাঠাতেন। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি মাত্রেই ন্যায্য হলে এরকম সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ডকেও শাস্তির মর্যাদা দিতে হয়।

প্রতিরোধবাদী শাস্তিবিধানের *তৃতীয় শর্তটি* সামাজিক স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি দেয়। এ শর্ত অনুসারে অপরাধীর শাস্তি এমন হওয়া চাই যাতে তার ফলস্বরূপ দেশের বা সমাজের নিরীহ মানুষজনের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, এ শর্তের মধ্যে কোনোরকম অস্বাভাবিকতা নেই। সকলেই এ-বিষয়ে একমত হবেন যে, দাগী অপরাধীদের কারাদণ্ড দেওয়া বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মূলে প্রধান সামাজিক উদ্দেশ্য একটাই। তা হল এসব দুষ্কৃতীদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে বাঁচানো। এরকম অপরাধী যতদিন সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে ততদিনই সমাজের পক্ষে মঙ্গল।

কিন্তু এই একটা অতি স্বাভাবিক শর্তের মধ্যেও বিভ্রান্তির বীজ আছে।

প্রথমত, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীরা ছাড়া অন্যসব অপরাধী একদিন বা একদিন সমাজে ফিরবেই। দীর্ঘদিন কারাবাসের পর সমাজে ফিরে এসব অপরাধী কি সুস্থ সমাজের উপযুক্ত জীবনযাপনে সক্ষম হবে? সমাজ কি তাদের স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারবে? এদের উপস্থিতিতে সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত থাকবে কি? মনোবিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, প্যারোল বোর্ডের সদস্যরা তো নন-ই—এমন কি, অপরাধীরা নিজেরাও আজ পর্যন্ত এসব প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেনি। জাঁক থিরো তাঁর *এথিকস : থিওরি অ্যানড প্র্যাকটিস* বই-তে নিজের দেখা দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যেখানে সুস্থ সমাজজীবনে ফিরে আসার পরেও একজন প্রাক্তন অপরাধী আবার অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছে। একটি ঘটনার নায়ক একজন সুলেখক। খবরের কাগজের অফিসে একটা চাকরিও সে পেতে চলেছিল। এমন সময় কোনো দুষ্কর্মের অপরাধে তার কারাবাস হয়। কারাজীবন থেকে ফিরে এসে এ ব্যক্তি সাংবাদিকতায় ডিগ্রী নেয় এবং পত্রপত্রিকায় লেখালেখি শুরু করে। কিছু কিছু লেখা সুধীজনের সমাদর লাভ করেছিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই এ ব্যক্তি একটা বিশ্রী খুনের

অপরাধে আবার জেলে যেতে বাধ্য হয়। অন্য ঘটনাটির কেন্দ্রে আছে আট বছর জেল খাটা এক অপরাধী। ড্রাগ নেওয়া এবং ড্রাগের ব্যবসা চালানোর অপারাধে তার জেল হয়েছিল। কারাদণ্ড শেষ হওয়ার পর এই তরুণ কলেজে ভর্তি হয় এবং বাণিজ্যের পাঠ নেয়। একটা সম্মানজনক ব্যবসাও সে ধীরে ধীরে শুরু করে। কিন্তু এই সময় তার বিবাহিত জীবনে অশান্তি দেখা দেওয়ায় সে আবার ড্রাগের নেশা শুরু করে। আস্তে আস্তে তার ব্যবসাটা উঠে যায়। একদিন একটা খুনের চেষ্টার অপরাধে সে ধরা পড়ে এবং পুনরায় তার কারাবাস শুরু হয়। থিরো-র মতে এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাধারণ শাস্তি খুব কার্যকর নয়।

দ্বিতীয়ত, এটা ঘটনা যে, কোনো কোনো অপরাধের মূলে থাকে তাৎক্ষণিক চিত্তবিভ্রম। যথা, ক্ষণক্রোধ ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় যে, অপরাধী এ-জাতীয় দুষ্কর্ম দ্বিতীয়বার ঘটাতে উদ্যোগী হবে না। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে অপরাধীর হাতে সামাজিক নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশংকা প্রায় নেই বললেই হয়। এখন, শাস্তিদানের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, শাস্তির ফলস্বরূপ সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে, তাহলে এসব ক্ষেত্রে শাস্তিদানের উদ্দেশ্য বলেই কিছু থাকে না। ফলে, এরকম অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তিবিধান করতে যাওয়াটাই বাতুলতা বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ, খবরের কাগজে প্রায়-ই দেখা যায় যে, অনাহার এবং দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে পিতা তার শিশুসন্তানটিকে মেরে ফেলেছে। এক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায় যে, এ ব্যক্তি আর যাই হোক না কেন, সমাজের নিরাপত্তার পক্ষে অন্তত বিপজ্জনক নয়। হত্যাপ্রবণতা এর স্বভাবে নেই। ক্ষণকালের বিভ্রান্তি তাকে এই নিষ্ঠুর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করেছে। এখন, প্রতিরোধবাদী শাস্তিবিধানের তৃতীয় শর্তটি মানতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই এ ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া মুশকিল হবে। কেননা, ঐ শাস্তিবিধান অনুযায়ী শাস্তির অন্যতম উদ্দেশ্য হল সামাজিক নিরাপত্তাবিধান। প্রশ্ন হল ঃ এ ব্যক্তি কি তাহলে শাস্তির ঊর্ধ্বে থেকে যাবে? বলা বাহুল্য, প্রতিরোধবাদী তত্ত্ব অনুসারে এটাই হওয়া উচিত। কারণ, এ ব্যক্তির কাছ থেকে সমাজের ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কিন্তু সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থেকে যায় ঃ নিষ্পাপ শিশুটিকে এভাবে মেরে ফেলার মধ্যে কোনো অন্যায়-ই কি তাহলে হয়নি?

৫. সংশোধনাত্মক শাস্তিতত্ত্ব

সংশোধনাত্মক শাস্তিতত্ত্বের (Reform theory of punishment) উদ্গাতা বলতে দুই শ্রুতকীর্তি দার্শনিক। দূর অতীতে প্লেটো এবং নিকট অতীতে হেগেল। প্লেটো এবং হেগেল দু'জনের মতেই শাস্তিদানের মুখ্য উদ্দেশ্য হল অপরাধীর সংশোধন (reform) কিন্তু এ সংশোধনের স্বরূপ নিয়ে এঁদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। প্লেটোর মতে. সংশোধন-প্রক্রিয়া হল আদর্শ শাস্তির ছায়াসঙ্গী। অপরাধীর শাস্তি চলাকালীন অপরাধীকে

সংশোধন করার প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। অর্থাৎ সংশোধন যেন এক অর্থে শাস্তি-অতিরিক্ত একটা ব্যবস্থা, যা অপরাধীকে শাস্তি-অন্তে সুস্থ সমাজে পুনর্বাসন (rehabilitation) পেতে সাহায্য করে। এইজন্যে অনেকে প্লেটোর শাস্তিতত্ত্বকে *পুনর্বাসনমূলক* তত্ত্ব (theory of rehabilitation) বলেও অভিহিত করেন। অন্যদিকে হেগেলের শাস্তিতত্ত্বে পুনর্বাসন অর্থে সংশোধনের স্থান নেই। হেগেল এমন এক সংশোধনে বিশ্বাসী যা শাস্তিভোগের মধ্য দিয়েই অপরাধীর ভাগ্যে জুটে যায়। এরকম সংশোধন ঘটাবার জন্যে শাস্তি-অতিরিক্ত কোনো ব্যবস্থার কল্পনা করতে হয় না। প্রকৃত শাস্তি এমন যে, ঐ শাস্তির মধ্যেই অপরাধীর চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা প্রচ্ছন্ন থাকে। এইজন্যে অনেকে হেগেলের শাস্তিতত্ত্বকেই প্রকৃত অর্থে *সংশোধনাত্মক* তত্ত্ব (theory of reform) বলেছেন। আমরা এই বির্তকের মধ্যে না গিয়ে আলাদা আলাদাভাবে প্লেটো এবং হেগেলের শাস্তিতত্ত্বের মূল কথাগুলি উল্লেখ করে ক্ষান্ত থাকব। আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমে হেগেলের মতটি উল্লিখিত হবে।

শাস্তির যৌক্তিকতা (justification) প্রসঙ্গে হেগেলের মতামত প্রধানত পাওয়া যায় তাঁর *ফিলসফি অব্ রাইট গ্রন্থের* ৯৯ এবং ১০০ সংখ্যক অনুচ্ছেদে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, হেগেল যেন প্রতিকারবাদী শাস্তিতত্ত্বের (retributive theory of punishment) সমর্থনে কথা বলেছেন। হেগেলের অনেক ভাষ্যকারও এইরকম ভেবেছেন। ইউয়িং-এর লেখা *দ্য মরালিটি অব্ পানিশমেন্ট* বইটি এ-জাতীয় ভাষ্যের একটি দৃষ্টান্ত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে হেগেলীয় শাস্তিতত্ত্বের মূল সুরটি সংস্কারবাদী (reformist)। অপরাধীর বিশেষ এক ধরনের সংস্কার বা সংশোধনের দিকেই হেগেল আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে বলেন। হেগেলের মতে, একমাত্র শাস্তি পাওয়ার সূত্রেই এ সংশোধন অপরাধীর প্রাপ্য হয়।

হেগেল বুঝতে চেয়েছেন, অপরাধীর অন্যায়টি ঠিক কোথায়। ওঁর মতে, প্রতিটি অপরাধীর আসল পাপ বলতে একটাই। তা হল কোনো না কোনো নৈতিক বিধিকে (moral law) লঙ্ঘন করা। শাস্তির উদ্দেশ্য হল অপরাধীকে দিয়ে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করানো। কীভাবে এই প্রায়শ্চিত্ত হবে? হেগেল বলছেন, একমাত্র শাস্তিভোগের মধ্য দিয়ে। এভাবেই অপরাধী বুঝতে পারবে যে, নৈতিক বিধিটিকে লঙ্ঘন করা তার পক্ষে অন্যায় হয়েছে। এই সূত্রে তার মধ্যে অনুশোচনারও উদয় হবে। অর্থাৎ প্রকৃত শাস্তি অপরাধীকে তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ করতে শেখাবে। হেগেল মনে করেন, এই অনুশোচনার সূত্রেই অপরাধীর চিত্তশুদ্ধি ঘটে যাবে। সে নিজেকে ফিরে পাবে।

হেগেলীয় শাস্তিকল্পনার বিশেষত্বগুলি প্রকট হয় প্রচলিত অন্যান্য শাস্তিতত্ত্বের সঙ্গে এ তত্ত্বের তুলনা করলে। হেগেল নিজেও তাঁর গ্রন্থে এরকম তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। উদাহরণস্বরূপ, হেগেল আমাদের মনে রাখতে বলেছেন যে, তাঁর

শাস্তিতত্ত্ব যেন কোনোমতেই তথাকথিত পুনর্বাসনমূলক তত্ত্ব (theory of rehabilitation) বলে গণ্য না হয়। বস্তুত পুনর্বাসনমূলক শাস্তিতত্ত্বের প্রতি হেগেল কোনোদিনই সহানুভূতিশীল ছিলেন না। হেগেলের ভাবশিষ্য ম্যাকটাগার্ট তাঁর *স্টাডিজ ইন হেগেলিয়ান কসমলজি* বই-তে বলেছেন, যেসব বিষয় হেগেলের কাছে ঘোর অপছন্দের ছিল সেসবের অন্যতম হল আবেগসর্বস্ব মানবতাবাদ (sentimental humanitarianism)। হেগেল বিশ্বাস করতেন, তথাকথিত পুনর্বাসনমূলক শাস্তিতত্ত্বের মূলে এ-জাতীয় মেকি মানবতাবাদের ভাবধারা প্রচ্ছন্ন রয়েছে। সাধারণত পুনর্বাসনমূলক শাস্তিতত্ত্বের মধ্যে এইরকম একটা ইঙ্গিত থাকে যে, অপরাধীর শাস্তিভোগ চলতে থাকার সময় আমাদের কর্তব্য হল তাকে সংশোধন করা। হেগেলের দৃষ্টিতে এটা আমাদের উদ্যোগ নেওয়ার ব্যাপারই নয়। ন্যায্য শাস্তির স্বরূপই এমন যে, এ শাস্তিভোগের মধ্য দিয়ে অপরাধী নিজেই নিজের আত্ম-সংশোধনের রাস্তা খুঁজে নেয়।

পুনর্বাসনবাদীদের সঙ্গে হেগেলের আর একটা বিষয়ে ঘোর মতপার্থক্য রয়েছে। পুনর্বাসনবাদীরা যেকোনো শাস্তির জন্যে অপরাধীর কাছে ক্ষমা পর্যন্ত চাইতে প্রস্তুত। শাস্তি ব্যাপারটা যে মোটেই সুখকর নয়, এ নিয়ে পুনর্বাসনবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই। তাঁদের মতে, শাস্তি একটা বিস্বাদ কটুগন্ধ ওষুধের মত, যা উপায়ান্তরের অভাবে অপরাধীর ওপর প্রয়োগ করতে হয়। কিন্তু হেগেলের মতে, শাস্তি হল অপরাধীর পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। শাস্তি পেয়ে অপরাধী ধন্য হয়। কারণ, এ শাস্তি না পেলে তার মালিন্য ঘুচত না; সে তার স্বভাবগত নীতিবোধ থেকে বিচ্যুত থেকে যেত। হেগেল এই প্রসঙ্গে এতদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, শাস্তি হল মানুষের স্বভাবগত অধিকার—মানুষের আত্মশুদ্ধিকরণের অধিকার।

যেমন পুনর্বাসনবাদীদের সঙ্গে তেমনি প্রতিকারবাদীদের (retributionists) সঙ্গেও হেগেলের মতবিরোধ আছে। অনেক সময় হেগেলকে প্রতিকারবাদী হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। এর কারণ হিসাবে বলা হয়ে থাকে যে হেগেল তাঁর শাস্তিতত্ত্বের অপরাধের অবসান ঘটানোর ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। একদিক থেকে কথাটি ঠিক। কেননা, হেগেলের কাছে আসল সমস্যা হল, কীভাবে অন্যায়ের প্রতিবিধান করা যায়। বস্তুত এই সমস্যা সমাধান করতে গিয়েই তিনি অপরাধের অবসানকল্পে শাস্তিবিধানের কথা বলেছেন। এখন, প্রতিকারবাদীর কাছেও অপরাধের অবসান (annulment) ঘটানোই শাস্তিদানের আসল উদ্দেশ্য। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হেগেলও প্রতিকারবাদীর সুরে কথা বলছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অপরাধের অবসান করা (annulment of crime) বলতে প্রতিকারবাদী যা বোঝেন তার সঙ্গে হেগেলীয় দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য আছে। প্রতিকারবাদীর সঙ্গে হেগেল এ-বিষয়ে মোটামুটি একমত যে, অপরাধ এবং শাস্তির মধ্যে সমতা রক্ষা করা চাই। কিন্তু প্রতিকারবাদীরা

এভাবে সমতা রক্ষা করা বলতে বোঝেন অপরাধীকে তার কৃতকর্মের প্রতিফল পাইয়ে দেওয়া। তাঁদের মতে, এর মধ্য দিয়েই অপরাধীর অপরাধকর্মের অবসান হয়। অন্যদিকে, হেগেলের মতে, অপরাধ এবং শাস্তির মধ্যে সমতা রক্ষা করতে গেলে দেখা দরকার, শাস্তিদানের সূত্রে অপরাধ-পূর্ব স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসছে কিনা। অর্থাৎ হেগেল ধরে নিচ্ছেন যে, অপরাধ ঘটিয়ে অপরাধী এই জগতের শুভাশুভ ভারসাম্যে যেন একটা দোলাচল এনে দেয়। শাস্তির লক্ষ্য হল সেই ভারসাম্যটিকে যথাপূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। হেগেলের মতে, এভাবেই অপরাধীর অপরাধের অবসান হয়। হেগেলের এই শাস্তিকল্পনা বাস্তবে কার্যকর কিনা, তা নিয়ে নিশ্চয়ই নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এ-বিষয়ে সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, তাঁর অভিমতটি প্রতিকারবাদী অভিমত থেকে আলাদা। তা ছাড়া, হেগেল কতটা প্রতিকারবাদের বিপক্ষে ছিলেন তার সাক্ষ্য মেলে *ফিলসফি অব্ রাইট* গ্রন্থের ১০২ সংখ্যক অনুচ্ছেদে। সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, প্রতিকারবাদী শাস্তিতত্ত্বের মূল কথা হল আঘাতের প্রত্যাঘ্যাত (an injury of the injury)। বুঝতে অসুবিধা হয় না, হেগেল তথাকথিত প্রতিকারকে (retribution) সাধারণ প্রতিশোধের (revenge) সমগোত্রীয় হিসাবেই চিহ্নিত করেছেন।

প্রতিকারবাদী শাস্তিকল্পনার বিরুদ্ধে হেগেলের সর্বপ্রধান অভিযোগ হল, এ শাস্তি বস্তুত নেতিধর্মী। হেগেলের মতে, প্রতিকারবাদী কল্পনায় শাস্তির কোনো ইতিবাচক উদ্দেশ্য ফুটে ওঠে না। শাস্তি মাত্রেই এরকম তত্ত্বে একটা অমঙ্গলসূচক বা অকল্যাণকর চরিত্র (the superficial character of an evil) পেয়ে যায়। পক্ষান্তরে, হেগেলের দৃষ্টিতে শাস্তি সব সময়েই একটা ইতিবাচক পদক্ষেপ। শাস্তি পাওয়া অপরাধীর অধিকারের (right) মধ্যে পড়ে।

হেগেল প্রতিরোধবাদেরও (theory of deterrence) বিপক্ষে ছিলেন। প্রতিরোধবাদী শাস্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে হেগেলের প্রধান অভিযোগ হল, এ শাস্তিতত্ত্ব মানুষকে একটা গৃহপালিত কুকুরের মত দেখে। মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতাকে প্রতিরোধবাদ বিন্দুমাত্র মূল্য দেয় না। হেগেলের মতে, প্রতিরোধবাদী শাস্তির মূল কথা মানুষকে শাস্তির ভয় দেখানো। মনিব যেমন চাবুকের ভয় দেখিয়ে তার পোষ্য কুকুরটিকে এটা-ওটা করা থেকে নিবৃত্ত করে তেমনি প্রতিরোধবাদীও শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত করেন। হেগেল বলছেন, এই ভয়-দেখানোর মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হয়ে যায় যে, এ তত্ত্বে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বীকৃতি নেই। *ফিলসফি অব্ রাইট* গ্রন্থের 'সংযোজন' অংশের ৬২ সংখ্যক অনুচ্ছেদে হেগেল প্রতিরোধবাদী শাস্তিতত্ত্বের বিরুদ্ধে তাঁর এসব অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছেন।

আমরা দেখেছি, হেগেল অপরাধীর অনুতাপে আস্থা রাখতেন। প্রকৃত শাস্তি অপরাধীকে তার অপরাধের জন্য অনুতাপ করতে শেখাবে, এই ছিল হেগেলের বিশ্বাস।

হেগেলের মতে, এইভাবে অনুশোচনা করার মধ্য দিয়েই অপরাধী তার স্বাভাবিক নীতিবোধে ফিরে যায়। প্রশ্ন হল ঃ অনুতাপ বা অনুশোচনা (repentence) বলতে হেগেল কী বুঝতেন? সংক্ষেপে বলা যায় ঃ হেগেল-কথিত অনুতাপ হল অপরাধীর এক ধরনের উপলব্ধি (realization)। এই উপলব্ধি যে, অপরাধটি ঘটিয়ে সে অন্যায় করেছে, তার স্বভাবগত নীতিবোধ থেকে সে বিচ্যুত হয়েছে—সে স্বধর্মচ্যুত হয়েছে। এই উপলব্ধির হেতু কী? শাস্তিটি নিজেই? না, শাস্তিসূত্রে যে যন্ত্রণা (pain) বা বেদনা অপরাধীর প্রাপ্য হয়েছে সেইটি? হেগেলের কথা শুনে মনে হয়, অপরাধীর এ-জাতীয় উপলব্ধির মূলে ঐ যন্ত্রণাবোধটিই কাজ করছে। অপরাধীর যেটুকু চিত্তশুদ্ধি ঘটছে তা ওইরকম যন্ত্রণা পাওয়ার সুবাদে। এ যন্ত্রণাবোধ যদি অপরাধীর ভাগ্যে না জুটত তাহলে অপরাধী নিঃশঙ্ক থেকে যেত, তার বোধোদয় হত না। এখানে মনে রাখতে হবে, হেগেল কিন্তু অপরাধীকে যন্ত্রণার ভয় দেখিয়ে সংশোধন করতে চাইছেন না। সেক্ষেত্রে তিনি প্রতিরোধবাদী তত্ত্বের (theory of deterrence) সমর্থক হয়ে যেতেন। হেগেলের দৃষ্টিতে এরকম যন্ত্রণা নিজেই চিত্তশুদ্ধির কারক। শাস্তিসূত্রে প্রাপ্য যন্ত্রণার মধ্যেই এমন কিছু আছে যা অবধারিতভাবে অপরাধীকে আত্ম-সংশোধনের পথে নিয়ে যায়, তাকে অনুতাপী করে তোলে।

সংশোধনাত্মক শাস্তিতত্ত্বের (Reform theory of punishment) অপর উদগাতা হলেন প্লেটো। প্লেটোর মতে, অপরাধী মাত্রেই নৈতিক দিক থেকে অসুস্থ। তাই অপরাধ বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকের দায়িত্ব হল অপরাধীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। চিকিৎসা বলতে অবশ্যই এখানে অপরাধী-মনের চিকিৎসার কথা বুঝতে হবে। প্লেটোর এই শাস্তিতত্ত্বের মূল বক্তব্য হল তিনটি, যথা ঃ

১. অপরাধপ্রবণতা এক ধরনের মানসিক রোগ। এ রোগ অপরাধী ব্যক্তিসত্তাকে কুরে কুরে খায় এবং শেষ পর্যন্ত তার ব্যক্তিসত্তা বিলোপের কারণ হয়।
২. শাস্তি মাত্রেই এক ধরনের নৈতিক মহৌষধ (moral medicine)। এ ওষধি বিস্বাদ কিন্তু স্বাস্থ্যকর।
৩. রাষ্ট্র এবং অপরাধীর মধ্যে সম্বন্ধটি হওয়া উচিত প্রতিপালক-প্রতিপালিতের সম্বন্ধ।

শুধু প্লেটো নন, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের অনেক দিকপাল দার্শনিককেই এই ধরনের শাস্তিতত্ত্ব সমর্থন করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, সাধু টমাস অ্যাকুইনাসের কথা বলা যেতে পারে। অ্যাকুইনাসের মতে, শাস্তি একটা রোগহর ওষুধের মত কাজ করে। এ ওষুধ কেবলমাত্র অতীত পাপ থেকেই অপরাধীকে মুক্তি দেয় না তাকে ভবিষ্যৎ অপরাধকর্ম থেকেও নিবৃত্ত করে। সাধারণ রোগীকে সারিয়ে তুলতে চিকিৎসক যেমন কখনও কখনও অত্যন্ত কটুস্বাদের ওষুধ খাওয়ার পরামর্শ দেন শাস্তিও তেমনি একটি অতি বিরক্তিকর

ব্যবস্থা। কিন্তু এতে অপরাধীর শেষ পর্যন্ত মঙ্গলই হয়, অমঙ্গল হয় না। অর্থাৎ, চিকিৎসা অন্তে রোগী যেমন স্বাভাবিক জীবনযাপনের মধ্যে ফিরে যায়, সত্যিকারের শাস্তিভোগ শেষে অপরাধীও তেমনি সুস্থ সমাজজীবনে পুনর্বাসন পায়। এই জন্যে এ-জাতীয় সংশোধনাত্মক শাস্তিতত্ত্ব *পুনর্বাসনমূলক শাস্তিতত্ত্ব* (Rehabilitationist theory of punishment) নামেও অভিহিত হয়েছে।

প্লেটো-কথিত পুনর্বাসনমূলক শাস্তিতত্ত্বকে কেন্দ্র করে ইদানীং যেসব প্রশ্ন বারবার আলোচিত হচ্ছে সেগুলির অন্যতম হল ঃ এই ধরনের শাস্তিতত্ত্বে নিয়মের (rules) ব্যাখ্যা কীরকম হবে? অপরাধী মাত্রেই কোনো না কোনো নিয়মভঙ্গের দায়ে পড়ে, এ তো জানা কথা। সমস্যা হল, এসব নিয়ম সব এক গোত্রের নয়। কতকগুলি নিয়মকে বলা যায় বিধিসিদ্ধ নিয়ম (formal rules), যেমন, আইনের অনুশাসন ইত্যাদি। অন্য কতকগুলি নিয়মকে বলা যায় বিধিবহির্ভূত নিয়ম (informal rules), যেমন, প্রথাসিদ্ধ লোকাচার ইত্যাদি। পুনর্বাসনমূলক শাস্তিতত্ত্ব দাবি করে যে, উভয় প্রকার নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রেই অপরাধীকে সংশোধনী ব্যবস্থার হাতে তুলে দিতে হবে। অর্থাৎ যারা বিধিসিদ্ধ নিয়মভঙ্গের দায়ে পড়ছে আর যারা বিধি-বহির্ভূত নিয়মভঙ্গের দায়ে পড়ছে তারা সকলেই একই স্তরের অপরাধী। অন্যভাবে বলা যায় ঃ যারা দেশের বিধিবদ্ধ দণ্ডনীতি (penal code) অগ্রাহ্য করছে তাদের অপরাধ আর যারা প্রথাসিদ্ধ লোকাচার (customary code) অগ্রাহ্য করছে তাদের অপরাধ যেন গুণগতভাবে (qualitatively) অভিন্ন। পুনর্বাসনমূলক শাস্তিবাদী তাই দাবি করেন যে, উভয় প্রকার অপরাধীকে অভিন্ন চোখে দেখতে হবে। এরা সকলেই সামাজিক ব্যাধির শিকার, তাই এদের সকলের ক্ষেত্রেই শাস্তির রূপ হবে সংশোধনাত্মক। এই হল পুনর্বাসনমূলক শাস্তিবাদীর কথা।

কিন্তু বেশিরভাগ অপরাধবিজ্ঞানী এবং আইনজ্ঞ এ দাবির সঙ্গে সহমত নন। তাঁরা মনে করেন, আইনী অনুশাসনের লঙ্ঘন আইনী শাস্তিরই (legal punishment) অপেক্ষা করে। অন্য কোনো প্রকারের শাস্তি এ-জাতীয় অপরাধের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বলে বিবেচিত হতে পারে না। বাস্তবেও দেখা যায়, সংশোধনাত্মক শাস্তিবাদীরা অপরাধীর যেরকম পুনর্বাসনের (rehabilitation) কথা বলেন তার সুযোগ নিতে তারাই বেশি আসে যারা বিধিবহির্ভূত (informal) নিয়মভঙ্গের জন্য দায়ী হয়েছে। যারা আত্মহত্যা করতে গিয়ে সফল হয়নি, যারা বিবাহিত জীবনের অলিখিত নিয়মবিধি ভঙ্গ করেছে, যারা অবৈধ সন্তানের জন্ম দিয়েছে, এরা-ই বাস্তবে পুনর্বাসন প্রার্থী। এরা-ই ঘরে ফিরতে চায়, এরা-ই স্বাভাবিক জীবনের স্বপ্ন দেখে বেশি করে। সমাজকর্মীদের কাছে এদেরই আবেদন। যারা আইনী অনুশাসন উপেক্ষা করে রাজদণ্ডের শিকার হয়েছে সেইসব অপরাধীকে পুনর্বাসন চাইতে বড় একটা দেখা যায় না। এসব তথ্য থেকে প্রমাণ হয় যে, পুনর্বাসনমূলক শাস্তিতত্ত্ব (rehabilitationist theory of punishment) কেবলমাত্র

একধরনের নিয়মভঙ্গের ঘটনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছে। নিয়মতান্ত্রিকতার সামগ্রিক প্রতিফলন এ তত্ত্বে পড়েনি বলেই মনে হয়।

৬. চরমদণ্ড ঃ পক্ষে-বিপক্ষে

শাস্তির মূল চেহারাটা হল গ্লানিভোগের চেহারা। হয় সম্মানহরণের গ্লানি, নয় অধিকার হরণের গ্লানি, এমন কি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অঙ্গহানির গ্লানিও (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তালিবানী আফগানিস্থানে কোনো কোনো অপরাধের শাস্তি ছিল হাত-পা কেটে নেওয়া)। কিন্তু সাধারণত এগুলোর কোনোটাই চূড়ান্ত ক্ষয়ক্ষতির দ্যোতক নয়। কারণ, এরকম প্রতিটি ক্ষেত্রেই অপরাধীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদটি—তার প্রাণসম্পদটি—অবিকৃত থেকে যাচ্ছে। প্রাণরক্ষার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না। কিন্তু কিছু কিছু অপরাধ আইনের চোখে এমন যে, সেইসব ক্ষেত্রে অপরাধীর এই অধিকারটিও হরণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। তার ভাগ্যে তখন জোটে মৃত্যুদণ্ড। এইটিই চরমদণ্ড (capital punishment), কেননা এর চাইতে কঠিন এর চাইতে অপমানকর আর কোনো শাস্তি হয় না।

মৃত্যুদণ্ডের যৌক্তিকতা নিয়ে আইনী তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। ইদানীং এ বিতর্ক প্রসারিত হয়েছে আইন জগতের বাইরেও। খবরের কাগজে, দূরদর্শনে, রেডিও-তে তো বটেই, তা ছাড়া প্রবন্ধ, বই, প্রচারপুস্তিকা, প্রচারপত্র এসবের মধ্য দিয়েও মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে-বিপক্ষে তর্কের জাল বিস্তৃত হয়ে চলেছে। পশ্চিমের অনেক দেশে জামার বোতাম, টি-শার্ট থেকে শুরু করে গাড়ির কাঁচ পর্যন্ত এ-বিষয়ে মতামত প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে আজকাল। যেটা লক্ষণীয় তা হল, এইভাবে পক্ষে-বিপক্ষে জনমত গঠনের মধ্য দিয়ে কেবল আইনী কূট-কচালিই উঠে আসছে না, সঙ্গে সঙ্গে নীতিধর্ম বা এথিকসের মূল প্রশ্নগুলোও উঠে আসছে। অর্থাৎ, নীতিধর্মের দৃষ্টিতে মৃত্যুদণ্ড ন্যায্য কিনা সেই প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। এক দিক থেকে দেখলে এটা স্বাভাবিকও, কেননা সাধারণ মানুষ আইনের মারপ্যাঁচ ততকিছু বোঝে না, কিন্তু উচিত-অনুচিত বিষয়ে তার কিছু কিছু সযত্নলালিত বিশ্বাস-অবিশ্বাস থাকেই থাকে। ট্রামে-বাসে-রাস্তায় সাধারণ মানুষ যখন ভ্রূণহত্যা, স্বস্তিমৃত্যু, মৃত্যুদণ্ড এসবের যৌক্তিকতা সম্পর্কে মতামত দেয় তখন সেইসব মতামতের মধ্যে এই আজন্মলালিত নীতিধর্মবোধেরই প্রকাশ ঘটে যায়। এরকম কথোপকথনের ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায়, বক্তা তার শ্রোতাকে নিজের দলে টানবার চেষ্টা করছে। অর্থাৎ, ভ্রূণহত্যা কিংবা মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে নিজের মতামত শ্রোতার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইছে। এই যে নীতিবাক্যের ফুলঝুরি ছুটিয়ে অন্যকে নিজের নীতিধর্ম-বিশ্বাসের শরিক করার চেষ্টা, এটা এ-জাতীয় মেঠো তর্কবিতর্কের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। অনেকে তাই এইরকম নীতিধর্মকথনকে 'নীতিবোধালংকার' (moral rhetoric) নামে অভিহিত করেছেন। মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে-বিপক্ষে যাবতীয় জনমত বিস্তারের মধ্যে এই অলংকৃত

নীতিধর্মকথনের ছাপ সুস্পষ্ট। তা সে সংসদীয় বিতর্কের ক্ষেত্রেই হোক অথবা রেডিও-টি. ভি.—পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জনমত গঠনের ক্ষেত্রেই হোক।

অলংকৃত নীতিধর্মকথনের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। তার মধ্যে একটির কথা এখানে না বললেই নয়। সেটিকে বলা যায় যৌক্তিকতা (justification) বিচারের সীমাবদ্ধতা। উদাহরণস্বরূপ, মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে যুক্তি দিতে গিয়ে সাধারণ জনমত অনেক সময় এই কথা বলে যে, বারংবার নৃশংস খুনের দায়ে অভিযুক্ত অপরাধীর মৃত্যুদণ্ডই শ্রেয় কেননা তাহলে একদিকে যেমন এই খুনীর হাত থেকে ভবিষ্যতে কয়েকটি জীবন রক্ষা পাবে তেমনি এই চরমশাস্তি দেখে উঠতি অপরাধীরাও এইরকম অপরাধকর্ম থেকে নিবৃত্ত হবে। লক্ষণীয়, এখানে একটা সংখ্যাতত্ত্বের বিচার অপেক্ষিত থেকে যাচ্ছে। প্রশ্নটা হল ঃ কতজনের জীবন রক্ষা পাবে, কতজন উঠতি অপরাধী নিবৃত্ত হবে? ধরা যাক, ক-কে ফাঁসি দিলে তিনটি জীবন রক্ষা পেতে পারে, পাঁচজন উঠতি অপরাধী ভয় পেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন হল ঃ তিনজনের জীবন রক্ষাকল্পে একজনের জীবনে ছেদ টেনে দেওয়া কোন্ নীতিধর্মের বিচারে সঙ্গত? যৌক্তিকতা বিচারের এই স্তরে অলংকৃত নীতিধর্মকথন (moral rhetoric) প্রায়ই পৌঁছোয় না। সাধারণ জনমতের নীতি-বিচারধারা এই অর্থে একটা সীমাবদ্ধতায় ভোগে।

সাধারণ জনমতের বিচারধারা যেখানে থেমে যায়, নরম্যাটিভ এথিকসের যুক্তিবিচার ঠিক সেই জায়গা থেকে শুরু হয়। যেসব যুক্তি দেখিয়ে সাধারণ জনমত মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দেয়, নরম্যাটিভ এথিক্স সেইসব যুক্তির আরও গভীরে যায়। সেইসব যুক্তির যৌক্তিকতা বিচার করে। এদিক থেকে দেখলে নরম্যাটিভ এথিক্স বা আদর্শমুখী নীতিবিদ্যার কাজ হল আপাতদৃষ্ট যৌক্তিকতার (justification) মূলে আরও গভীর যৌক্তিকতার অনুসন্ধান। মৃত্যুদণ্ডের ন্যায্যতা বিচারের বেলায় নরম্যাটিভ এথিকসে এইরকম দুটি অনুসন্ধানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। একটি *উপযোগবাদী* (utilitarian) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে, অপরটি *অ-উপযোগবাদী* (non-utilitarian) দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। মনে রাখা দরকার, উপযোগবাদী হলেই যে মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে কথা বলতে হবে বা অ-উপযোগবাদী হলেই যে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে রায় দিতে হবে, ব্যাপারটা সেরকম নয়। একজন উপযোগবাদী উপযোগবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে যুক্তিবিস্তার করতে পারেন, আবার ঐ একই দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতাও করতে পারেন। অন্যদিকে, একজন অ-উপযোগবাদী ইচ্ছে করলে অ-উপযোগবাদী আদর্শের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে রায় দিতে পারেন, আবার ঐ একই আদর্শের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষেও মত দিতে পারেন। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে মোট চাররকম সম্ভাবনার পথ খোলা থাকছে। যথা ঃ

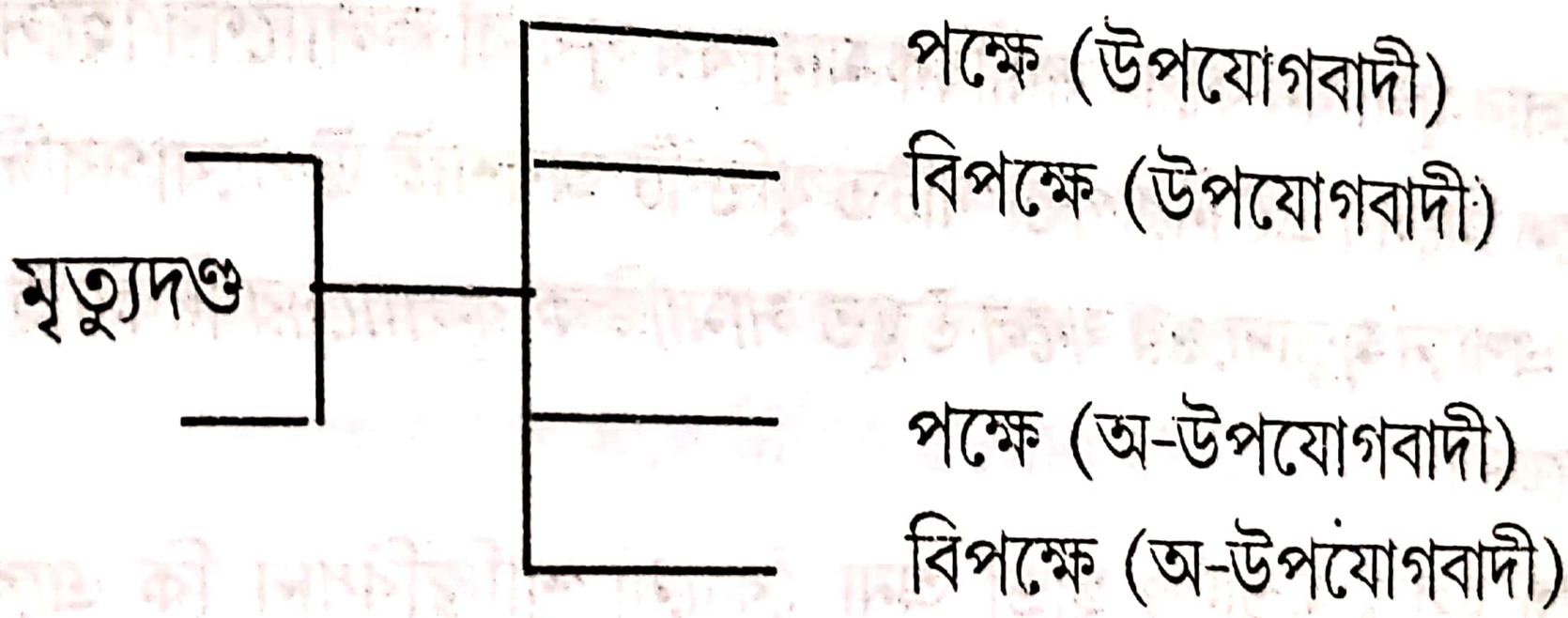

নরম্যাটিভ এথিকসের ইতিহাস ঘাঁটলে চাররকম মতামতেরই সন্ধান পাওয়া যাবে। আমরা অবশ্য এখানে তিনটির দৃষ্টান্ত দেব। প্রথমটি মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে একজন উপযোগবাদীর যুক্তিবিস্তারের দৃষ্টান্ত, দ্বিতীয়টি মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে একজন উপযোগবাদীর অভিমত এবং তৃতীয়টি মৃত্যুদণ্ডের সমর্থনে একজন অ-উপযোগবাদীর বক্তব্য।